31st May, 2021

সোতস্বিনী

সত্যজিৎ স্মরণ সংখ্যা

স্রোতস্বিনী

নরসিংহ দত্ত কলেজ
বাংলা বিভাগ

সম্পাদক
প্রীতি ঘোষ

প্রচ্ছদ নির্মানে ও অলংকরনে
সন্দীপ দাস

সম্পাদকীয় বক্তব্য...

"আজকে হতে জগৎমাঝে ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে তোমার হবে জয়-
আমি ছাড়ব সকল ভয় ।"

~ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবন গুছিয়ে নেয় নিজের মতোই । আজ চারিপাশে অতিমারীর ডামাডোল; শৃঙ্খলা ভেঙেছে প্রকৃতিও ।মারণ বীজাণুর বিজ্ঞপ্তিতে মৃত্যু ঘিরেছে শোকের পর শোক । তবুও জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তবুও গল্প ভাসে ,তবুও জীবন চলে নিজের মতোই । বদলেছে শুধু বেঁচে থাকার মাধ্যমটুকু, স্মার্টফোনের আওতায় এসেছে রোজনামচার উল্লাস, অনুভূতির আলাপন। আর দেখা হয় না আমাদের তবুও আমরা বেঁচে থাকি একে অপরের সঙ্গেই ।

এভাবেই আবহমান নরসিংহ দত্ত কলেজের বাংলা বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা "স্রোতস্বিনী "। আগের বছরেই স্রোতস্বিনী গোত্রান্তরিত হয়ে ধরা দিয়েছে বৈদ্যুতিন্ পরিসরে । সেই ধারাই অব্যাহত রেখে এবছরও বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা 'সত্যজিৎ স্মরণ'সংখ্যা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি,যিনি শুধুমাত্র চলচ্চিত্রকার -ই নন নিজের দক্ষ প্রতিভার দ্বারা শিল্পী হিসেবেও মন জয় করে নিয়েছেন আপামর পৃথিবীবাসীর। একেবারেই সাদামাটাভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের চেষ্টাটুকু করেছি মাত্র । অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য সকলে মার্জনা করবেন, পাঠকবৃন্দকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ।যাঁদের উৎসাহ আমাদের ভীষণভাবে প্রাণিত করে । সকলের জন্য রইল অনেক শুভকামনা ; সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই আমাদের একান্ত কাম্য ।

ধন্যবাদান্তে ,
প্রীতি ঘোষ,ষষ্ঠ সেমিস্টার

সূচি

চিরঞ্জিবী সত্যজিৎ রায় : শতবর্ষ পেরিয়ে
সুরশ্রী দাস ১

সংগীত আবহে সত্যজিৎ রায়
সায়ন দাস ২

আমার চোখে সত্যজিৎ রায়
দেবব্রত গুছাইত ৪

আমার চোখে অস্কারজয়ী সত্যজিৎ
ঋতুবৃত্তা দত্ত ৫

সত্যজিৎ রায় ও তারিণীখুড়ো
অয়ন বর ৬

নারীর স্বমহিমায় সত্যজিৎ
প্রীতি ঘোষ ৮

সত্যজিৎ রায় : জন্মশতবর্ষে কিছু কথা
মেঘা পাত্র ১০

সত্যজিৎ রায়ের অনন্য সৃষ্টি প্রোফেসর শঙ্কু
সুকল্যান মুখার্জী ১২

হীরক রাজার দেশে ও তার বর্তমানে রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা
সপ্তর্ষি মুখার্জী ১৩

আঁকি বুঁকি

সায়ন্তনী দাস ৩ | সুস্মিতা সাহা ৭ | বিপাশা সাহা ১১ | মৌসুমী পোল্ল্যে ১১ | সন্দীপ দাস ১৪ | অঙ্কিতা মান্না ১৪

চিরঞ্জিবী সত্যজিৎ রায় : শতবর্ষ পেরিয়ে

পৃথিবীর যে সকল অমর প্রতিভাধর স্রষ্টা ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে এই মহান ভূমিকে ধন্য করেছেন তাদের অন্যতম হলেন বাঙালি কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়। অদ্ভুত সৃজনশীল শক্তির অধিকারী এই মানুষটির জন্মশতবর্ষে তাঁর অসামান্য সৃষ্টি নৈপুণ্যকে নতুন করে উপলব্ধি ও তাঁর শিল্পকর্মকে প্রসারিত করে দেবার অবকাশ এসেছে। তাঁকে কোন একটি অভিধায় অভিহিত করা যায় না। একদিকে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাতা,প্রযোজক,চিত্রনাট্যকার,গীতিকার,সঙ্গীত পরিচালক,অন্যদিকে লিপি-কলাবিদ,অঙ্কন শিল্পী,সাহিত্যিক।

২মে ১৯২১,কলকাতায় তাঁর জন্ম,মৃত্যু ১৯৯২। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি,পিতা সুকুমার রায়,মাতা সুপ্রভা দেবী। শৈশব শিক্ষার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেন পরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে শিল্পকলা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

চলচ্চিত্র নির্মাতা রূপে তাঁর কাজের পরিমাণ বিপুল। তাঁর প্রথম সিনেমা “পথের পাঁচালী ”(১৯৫৫) যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটকেই বদলে দিয়েছিল। ছবিটি মোট ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছিল। তাঁর অন্যান্য ছবিগুলি হল অপরাজিত, জলসাঘর,কাঞ্চনজঙ্ঘা,মহানগর,নায়ক,গুপী গাইন বাঘা বাইন,অশনি সংকেত, সোনার কেল্লা,জয় বাবা ফেলুনাথ,হীরক রাজার দেশে,গণশত্রু,আগন্তুক’। তাঁর কর্মজীবনের সব থেকে বিখ্যাত পুরস্কার হল একাডেমি সম্মানসূচক পুরস্কার (অস্কার)। জাপানি পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন –“যিনি সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র কখনও দেখেননি,তিনি যেন এই পৃথিবীতে বাস করেও সূর্য এবং চন্দ্র দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছেন নিজেকে”।

অসামান্য সাহিত্যকীর্তির জন্য তিনি আজও বাঙালির রক্তস্রোতে মিশে আছেন। ‘সন্দেশ’ পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ (১৯৬১) উপলক্ষে বাংলা সাহিত্যে রচনা শুরু তাঁর। ‘প্রোফেসর শঙ্কু’ (১৯৬৫)ও গোয়েন্দা ‘ফেলুদা' তাঁরই সৃষ্টচরিত্র।অবিস্মরণীয় সৃজনশীলতার স্বীকৃত স্বরূপ সত্যজিৎ বহু সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারতরত্ন ও লিজিয়ন অফ অনার সম্মান।কল্পকাহিনি,গোয়েন্দা কাহিনি, উপন্যাস, গল্প, স্মৃতিকথা,সম্পাদিত,সংকলিত ও অনূদিত গ্রন্থ মিলিয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা ষাটের অধিক।

পরিশীলিত মনন,অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী সত্যজিৎ রায় চিরকালই প্রগতিশীল ও আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নানা কাজের মাধ্যমে পৃথিবীর বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নানা পরিচালকরা একথা স্বীকার করেন যে তাঁদের চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের বিশেষ প্রভাব রয়েছে।তাঁর জীবনের অমূল্য সব সৃষ্টির দ্বারা তিনি পৃথিবীবাসীর হৃদয়ে চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন।

সুরশ্রী দাস
৬ষ্ঠ সেমিস্টার

সংগীত-আবহে সত্যজিৎ রায়

“আজকে মোদের বড়ই সুখের দিন

আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছি স্বাধীন.....

আজ আবার মোরা ভবঘুরে

মুলুক ছেড়ে যাবো দূরে

ভরবো ভুবন গানের সুরে.....”

গানের সুরে সত্যজিৎ রায়ের এই কথাগুলি যেন তাঁরই জীবনের প্রতিচ্ছবি । ছোটো থেকে সংগীতানুরাগী সত্যজিৎ রায়ের কর্মসূত্রে বিলাত যাত্রা, আর তারপরই চলচ্চিত্রের প্রেমে পড়া এবং দেশে ফিরে “পথের পাঁচালী” চলচ্চিত্রটির নির্মাণ ,এসব ঘটনা আমাদের উপরিউক্ত গানের কথাগুলিকে সত্যজিৎ-এর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে প্রলোভিত করে।

চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে কাজ শুরুর পর প্রথমে তিনি শুধু চিত্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। পরে তিনি ছবির জন্য সঙ্গীত রচনা,আবহ-সঙ্গীত নির্মাণ এবং সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেন। এর কারণ হিসাবে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান - তিনি রবিশঙ্কর,ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ-এর মতো স্বনামধন্য শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছেন। ওঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্রে সুদক্ষ ছিলেন। তবে সত্যজিৎ রায়ের মতে ওঁরা কেউই প্রশিক্ষিত ‘ফ্লিম কম্পোসার’ ছিলেন না। এবং তাঁরা কনসার্ট পারফর্মার হওয়ায় তাদের দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করতে হত,তাই তাঁদের সবসময় পাওয়া যেত না। এমনকি “পথের পাঁচালী” (১৯৫৫)চলচ্চিত্রটি রবিশঙ্কর মাত্র অর্ধেক দেখেছিলেন। এইসব অসুবিধার কারণে ১৯৬০ সালে “তিন কন্যা”র সময় থেকে সত্যজিৎ রায় সিদ্ধান্ত নেন তিনি নিজেই মিউজিক কম্পোজ করবেন। সত্যজিৎ মনে করতেন ভারতীয় রাগসঙ্গীত এবং ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র,যেমন –সেতার,সানাই, সব ছবিতে ঠিকঠাক ভাবে খাপ খায় না,তাই তিনি শুরু করলেন সঙ্গীত নিয়ে কাটাছেঁড়া। ওয়েস্টার্ন মিউজিক এর সঙ্গে ইস্টার্ন মিউজিক এর সংমিশ্রণে সৃষ্টি করলেন নিত্য নতুন সাউন্ড ট্র্যাক।

“পথের পাঁচালী”চলচ্চিত্রটির গ্রাম্য পরিবেশ অথচ চরিত্রবর্ণনে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নজর রেখে,শুধু গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে নির্দ্বিধায় বাঁশি,গুপীযন্ত্র, ঢোল ইত্যাদির সঙ্গে সেতার,সরোদ,পাখোয়াজ মিশিয়ে ফেললেন রবিশঙ্করের সহায়তাতেই,সৃষ্টি হল কিংবদন্তী আবহসঙ্গীত।

পাহাড়ি লোকসঙ্গীতকে ভেঙে দেশি-বিলাতি বাদ্যযন্ত্রের একক ও সমবেত মিশ্রণকে ঘটিয়ে সৃষ্টি করলেন “কাঞ্চনজঙ্ঘা”র আবহসঙ্গীত।

ছোটোদের জন্য তৈরি চলচ্চিত্র “গুপী গাইন বাঘা বাইন”-এ ‘মরসিংগ’,’মৃদঙ্গ’,’খাঞ্জিরা’ এবং ‘ঘাতাম’ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তৈরি করলেন ভূতেদের নাচের সেই অমর মিউজিক্যাল ট্র্যাক। ছবিটির শেষে সত্যজিৎ রায়ের যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের আভাস পাওয়া যায় সেই বিখ্যাত গানের মাধ্যমে-

“ওরে বাবা,দেখো চেয়ে,কত সেনা চলেছে সমরে .....

ওরে হাল্লা রাজার সেনা

তোরা যুদ্ধ করে করবি কী,তা বল.....

রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্বে অমঙ্গল”

তার আরেকটি ছোটোদের জন্য তৈরি চলচ্চিত্র “হীরক রাজার দেশে”। এই ছবির গানগুলির সহজ সরল ভাষা,মজার ছন্দ কচিকাচাদের মাতিয়ে তোলে। এই শিশুভাবের আড়াল থেকে সত্যজিৎ তুলে ধরলেন রাষ্ট্রের উলঙ্গ রূপ চরণ দাসের কণ্ঠে-

“কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়...

দেখ ভালো জনে রইল ভাঙা ঘরে।

মন্দ যে সে সিংহাসনে চড়ে।

সোনার ফসল ফলায় যে তার

দুই বেলা জোটেনা আহার।

হীরার খনির মজুর হয়ে কানাকড়ি নাই।“

সত্যজিৎ রায় ছবির আবহ তৈরির জন্য অ্যাকচুয়াল শব্দ ব্যবহারে আগ্রহী ছিলেন। “মহানগর” চলচ্চিত্রটিতে ছবির মুড তৈরির জন্য গাড়ির শব্দ,মানুষের কোলাহল,লোহালক্কড়ের ঠোকাঠুকির আওয়াজের ব্যবহার এরই প্রমাণ দেয়।

আবার “অশনি সংকেত” চলচ্চিত্রটিতে “মতির” মৃত্যুর দৃশ্যে ,যখন ক্যামেরার ফোকাস ৪-৫ সেকেন্ড এর জন্য মতির চোখ খোলা মুখের উপর ঠিক তখনই কোনো প্রথাগত সিম্প্যাথেটিক মিউজিক না ব্যবহার করে তিনি ব্যবহার করলেন কাঠঠোকরা পাখির কর্কশ ডাক যা দর্শক মনে এক ভয়ার্ত শোকস্তব্ধতা জাগিয়ে তোলে।

সত্যজিৎ রায় নিজে মনে করতেন কাহিনীর অনেকখানি ব্যাপ্ত হয় সংলাপের মাধ্যমে, আরও কিছুটা বলা হয় যাবতীয় ধ্বনির সাহায্যে। সাহিত্য-চলচ্চিত্র জগতে ওঁর পরিধি মুক্ত আকাশ সম, তাঁর সম্পর্কে যতই বলি ততই কম বলে মনে হয়। ।পরিশেষে ওঁর গানের ভাষাতেই ওঁকে জানাই “মহারাজা তোমারে সেলাম”।

সায়ন দাস
৬ষ্ঠ সেমিস্টার

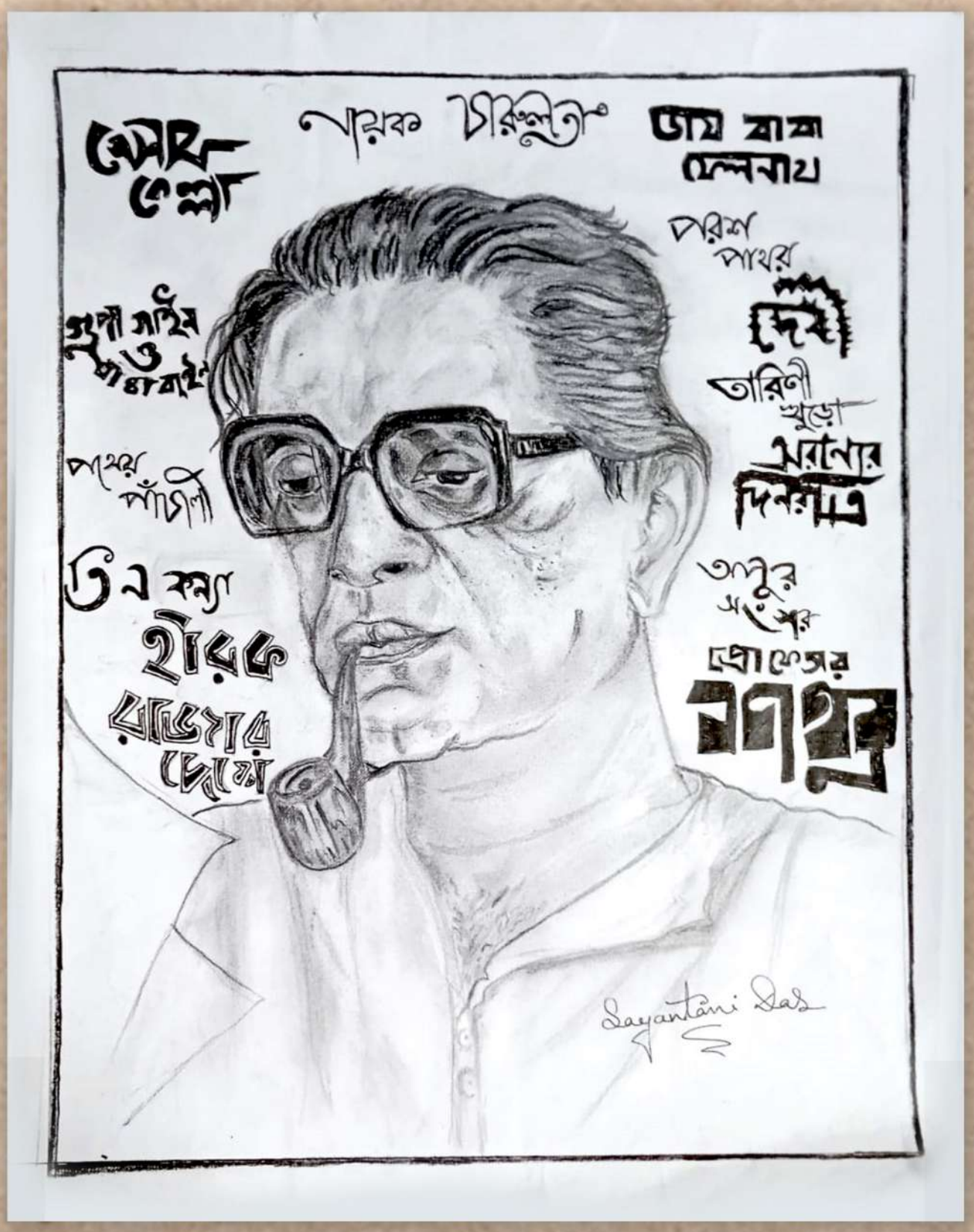

সায়ন্তনী দাস
২য় সেমিস্টার

আমার চোখে সত্যজিৎ রায়

বাংলা চলচ্চিত্রের জগতেএক খ্যাতিমান পরিচালক ছিলেন সত্যজিৎ রায়। ছোটোবেলা থেকেই মা- বাবার মুখে শুনতাম অপু- দুর্গার কাহিনী,চারুলতা এবং ছোটোবেলায় সাদা কালো টিভিতে গুপি গাইন বাঘা বাইন দেখেছি তখন বুঝিনি এই সমস্ত চলচ্চিত্রের স্রষ্টা কে?ছোটোবেলায় মনে আছে গুপি গাইন বাঘা বাইন সিনেমা দেখে " মহারাজা তোমারে সেলাম" গানটা গাইতাম।আজ বয়সে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খানিক জ্ঞানের আলোয় বুঝেছি এসবের স্রষ্টা কে?ছোটোবেলায় মায়ের মুখ থেকে শুনেছি সত্যজিৎ রায় নামটি কিন্তু তখন বুঝিনি এই নামের মধ্যে কত বড়ো ব্যাক্তিত্ব লুকিয়ে রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে " ভারতরত্ন" , "দাদা সাহেব ফালকে" পুরস্কার ও নানা উপাধি ছোটো হয়ে পড়ে।তিনি ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র তথা বাংলা ও বিশ্ব চলচ্চিত্র জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্ব চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম।তিনি ২মে ১৯২১ সালে কলকাতার বুকে রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।ছোটোবেলা থেকে আজও কোনো বাংলা চলচ্চিত্র যদি আমার মন্ত্রমুগ্ধ করে থাকে সেটি হলো সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী"(১৯৫৫)। তিনি মোট ৩৬ টি ছবি পরিচালনা করেছেন।তবে তাঁর পরিচালিত "পথের পাঁচালী" ও "অশনি সংকেত"(১৯৭৩) ছবি দুটির বিরুদ্ধে দারিদ্র্য রফতানিও বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অভিযোগ করা হয়েছিল। তাঁর চলচ্চিত্রের প্রতি অসীম গুণ ও ভালোবাসা শুধু পথের পাঁচালী ও অশনি সংকেত -এর ওপর থেমে থাকেনি। তাঁর পরিচালিত সেরা সিনেমা গুলি হলো – "অপরাজিতা"(১৯৫৬), "জলসাঘর"(১৯৫৮), "অপুর সংসার"(১৯৫৯), "মহানগর"(১৯৬৩), "চারুলতা"(১৯৬৪), "নায়ক"(১৯৬৬), "হীরক রাজার দেশে"(১৯৮০), "জয় বাবা ফেলুনাথ"(১৯৭৯) ইত্যাদি।

সত্যজিৎ রায় এমন একজন ব্যক্তি,তিনি কখনও নিজেকে শুধু চলচ্চিত্রের পরিচালক হিসেবে আটকে রাখেননি।তিনি তাঁর গুণের জাল বিছিয়েছেন সর্বত্র,তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন সকলের থেকে তিনি একটু হলেও আলাদা। তাঁর বৈচিত্র্যে সমন্বিতগুণের স্পর্শ পাওয়া যায় সঙ্গীত পরিচালক,লেখক, চিত্রনাট্যকার ও একজন সাহিত্যিক এবং শিল্প নির্দেশক হিসেবে নানা কাজে। তাঁর সৃষ্ট বিখ্যাত চরিত্র হলো গোয়েন্দা "ফেলুদা", বৈজ্ঞানিক "প্রফেসর শঙ্কু" ও "তারিণীখুড়ো। এই তিনটি চরিত্র ছাড়াও বেশ কিছু ছোটোগল্প ও উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন। তিনি মোট ৩৫ টি ফেলুদার গল্প লেখেন, যার সবগুলিই খুব জনপ্রিয় এবং এর মধ্যে দুটিকে নিয়ে তিনি নিজেই চলচ্চিত্র তৈরি করেন "সোনার কেল্লা"ও "জয় বাবা ফেলুনাথ"।তাঁর লিখিত অন্যতম ছোটোগল্প হলো "একের পিঠে দুই"। চলচ্চিত্রের ওপর তিনি কয়েক টি প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলি হলো "দেয়ার ফিল্মস"(১৯৭৬), "একেই বলে শুটিং"(১৯৭৯) ইত্যাদি।সত্যজিৎ রায় "তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম" নামে একটি ননসেন্স ছড়ার বই লেখেন।

চলচ্চিত্র থেকে সঙ্গীত পরিচালক, চিত্রনাট্যকার থেকে শিল্প নির্দেশক ও লেখক থেকে সাহিত্যকর্ম প্রতিটি জায়গায় তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করে রেখেছেন। বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে তিনি যেন শতবর্ষ পুরনো এক বটগাছের মতো যার শাখাপ্রশাখা বহুধাবিস্তৃত।.

দেবব্রত গুছাইত
৪র্থ সেমেস্টার

আমার চোখে অস্কারজয়ী সত্যজিৎ

" কাউকে দেখতে গেলে দুটো চোখ নয়,প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিশক্তি"–সত্যজিৎ রায়

চলচ্চিত্র জগতের এক বহুল চর্চিত উজ্জল ব্যক্তিত্ব হলেন সত্যজিৎ রায়। একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতার পাশাপাশি চিত্রনাট্যকার,শিল্প- নির্দেশক,সঙ্গীত পরিচালক এবং লেখক হিসেবে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত। তিনি সমগ্র জীবন ধরে অসাধারণ সব চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছেন। 'পথের পাঁচালী', 'চারুলতা', 'দেবী', 'সোনার কেল্লা', 'অপু', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'অশনি সংকেত', 'হীরক রাজার দেশে', 'তিন কন্যা' প্রভৃতি চলচ্চিত্রগুলি পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিস্ময়কর সৃষ্টি। এছাড়াও তিনি কাল্পনিক চলচ্চিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন 'ফেলুদা', 'প্রফেসর শঙ্কু', 'বাক্স রহস্য' যেগুলি শিশুমন তথা আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় স্পর্শ করে যায়

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে 'সন্দেশ' পত্রিকায় ফেলুদা সিরিজের প্রথম গল্প 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' প্রকাশিত হয়। রুপোলি পর্দায় সত্যজিৎ রায় ফেলুদার 'সোনার কেল্লা' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ' উপন্যাসদুটিকে চলচ্চিত্রায়িত করেন। ছোটোদের জন্য বাংলা ছবি তৈরি হয় না, সেই আক্ষেপ মিটিয়েছিল 'সোনার কেল্লা'। এই ছবির প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে যে ম্যাজিক রয়েছে তা কি কোনোদিন বাঙালি ভুলতে পারবে ? তবে 'সোনার কেল্লা চিত্ত–জয়ী, যে এই ছবি দেখেছে সে

ফেলুদা সম্পর্কে শৈশব কাল থেকেই আমার সম্যক্ ধারণা ছিল। বাল্যকাল থেকেই গোয়েন্দা গল্প আমার মনকে আকৃষ্ট করে। তাই ফেলুদা গোয়েন্দা কাহিনি দিয়েই আমার প্রথম গোয়েন্দা গল্প পড়ার সূচনা ঘটে। সত্যজিৎ রায়ের অনন্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে 'ফেলুদা' একটি অন্যতম কাল্পনিক গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে খ্যাত। কাহিনির মুখ্য চরিত্রে তিনজনকে দেখা যায় --- প্রদোষচন্দ্র মিত্তির (ফেলুদা) স্বয়ং,ফেলুদার প্রধান সহকারী তার খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র (তোপসে), ও লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি (ছদ্মনাম জটায়ু)। সত্যজিৎ - এর ফেলুদা মানেই ২৭ বছর বয়সী এক যুবক। তাঁর উচ্চতা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি , চোখে–মুখে ঠিকরে বার হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত আভা। তিনি একজন চিন্তাশীল মানুষ। অসম্ভব পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁর। ফেলুদার রহস্য উদঘাটন করার ভঙ্গিমা দর্শকের মনকে মুগ্ধ করে। সহকারী চরিত্রে তোপসের ভূমিকা অসামান্য। তোপসে চরিত্রটিতে মূলত শার্লক হোমসের রহস্য গল্পগুলোর ডাঃ ওয়াটসন চরিত্রের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। ফেলুদা গল্পে জটায়ুর চরিত্রটি বেশ মজার লাগে।

প্রেমে না পড়ে পারবে না, ওই রাজস্থান আর ওই অদ্ভুত রোম্যান্টিসিজম !' ১৯৭৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি। সেই সময়কার বক্স অফিসে ১৩ লক্ষ টাকা আয় করে 'সোনার কেল্লা' ! ১৯৭৯ সালের ৫ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল ফেলুদা সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ ছবি 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে হয়তো চলচ্চিত্রের বিচারে উনিশ–বিশের ফারাকে এগিয়ে থাকবে 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। মগনলাল মেঘরাজের সঙ্গে এই ছবিতে ফেলুদার দ্বৈরথ আজও ভুলতে পারেনি বাঙালি।

সত্যজিৎ রায় শুধু চলচ্চিত্রকার নয়,তিনি শিল্প–সাহিত্যের সক্রিয় সারথি। তাঁর সাধনা শিল্পের সাধনা, তাঁর ধর্ম শিল্পের ধর্ম। আধুনিক বাংলা সাহিত্য- সংস্কৃতি জগতের এক বিরল প্রতিভা তিনি। চলচ্চিত্র পরিচালনায় তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশে একটি নক্ষত্র হয়ে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। সত্যজিৎ রায়ের কাজের মাধ্যমে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত হয়েছে অস্কার জয়ের দ্বারা।

ঋতুবৃত্তা দত্ত
২য় সেমিস্টার

সত্যজিৎ রায় ও তারিণীখুড়ো

বিশ্বের একজন বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি সত্যজিৎ রায় বাংলা তথা ভারতের গর্ব। তিনি ছিলেন একই আধারে বহু গুণের অধিকারী--- চলচ্চিত্র পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, লিপি-কলাবিদ ও সাহিত্যিক। তাঁর জন্ম হয় 1921 সালের 2 রা মে।

সত্যজিৎ রায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পৌত্র এবং শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের পুত্র। তিনি শৈশবেই তাঁর পিতাকে হারান। শৈশব থেকেই ওঁর মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা ছিলো, যা পরবর্তীতে বিকশিত হয়েছিলো।

অদ্ভুত সৃজনশীল এই মানুষটি নিজের অসীম চিন্তনক্ষমতার দ্বারা যে সকল সৃষ্টি পৃথিবীকে উপহার দিয়ে গেছেন, তার সবগুলোই এককথায় অনবদ্য। তিনি পরিচালক হিসেবে পথের পাঁচালী *(1955)*, অপরাজিত *(1956)*,পরশপাথর *(1958)*, জলসাঘর*(1958)*, অপুর সংসার*(1959)*, দেবী*(1960)*,তিন কন্যা *(1961)*,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *(1961)*, কাঞ্চনজঙ্ঘা *(1962)*, অভিযান *(1962)*, মহানগর *(1963)*, চারুলতা*(1964)*, টু*(1964)*, কাপুরুষ ও মহাপুরুষ *(1965)*, নায়ক *(1966)*, চিড়িয়াখানা *(1967)*,গুপী গাইন বাঘা বাইন*(1968)*, অরণ্যের দিনরাত্রি *(1969)*, প্রতিদ্বন্দ্বী *(1971)*, সিকিম *(1971)*, দি ইনার আই*(1972)*, অশনি সংকেত *(1973)*, সোনার কেল্লা*(1974)*, জন অরণ্য *(1975)*, বালা*(1976)*, শতরঞ্জ কে খিলাড়ী *(1977)*, জয় বাবা ফেলুনাথ*(1979)*, হীরক রাজার দেশে *(1980)*, পিকু*(1980)*, সদগতি*(1981)*, ঘরে বাইরে *(1984)*, সুকুমার রায় *(1987)*, গণশত্রু *(1990)*, শাখা প্রশাখা*(1992)*, আগন্তুক *(1992)* ---এই সকল কালজয়ী চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অসামান্য কীর্তির জন্য পেয়েছেন ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার দাদাসাহেব ফালকে (1984), বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পেয়েছেন দুটি সিলভার বিয়ার, সান ফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে পেয়েছিলেন দুটি গোল্ডেন গেট, ফ্রান্স থেকে পেয়েছিলেন ন্যাশনাল অর্ডার অব দ্য লেজিও অনারের*(1987)*মতো সম্মান। পথের পাঁচালী-র জন্য নবম কান চলচ্চিত্র উৎসবে পেয়েছেন 'শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল ' *(*পিক্স দু দকুমেন্ট দুমাইন*)* পুরস্কার। এছাড়াও তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ভারতরত্ন ও অস্কার সম্মানেও ভূষিত হয়েছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের চলচ্চিত্র পরিচালকেরা তাঁদের চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের অবদান স্বীকার করে নিয়েছেন। এই বিদেশী পরিচালকদের মধ্যে জেমস আইভি, আব্বাস কিয়ারোসতামি এবং এলিয়া কালাম অন্যতম। বাংলা চলচ্চিত্রে গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন ও ঋতুপর্ণ ঘোষের মতন চলচ্চিত্র পরিচালকেরা তাঁদের চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের প্রভাবের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।

তবে এই মহান ব্যক্তিটির ব্যক্তিগত জীবন ছিল একেবারেই সাধারণ বাঙালির মতন। সাধারণ বাঙালির মতো তিনিও খাদ্যরসিক ও আড্ডাপ্রিয় ছিলেন। তিনি ফতুয়া ও পাজামা পরতে বেশ ভালোবাসতেন।

শিল্পী হিসেবে কলমের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন নানা স্কেচ আরপাশাপাশি তাঁর অসামান্য সব লেখনী। তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারও লাভ করেছেন। তিনি বহু ছোটোগল্পের পাশে লিখে গেছেন ফেলুদা, প্রফেসর শঙ্কু ও তারিণীখুড়োর মতো চরিত্রনির্ভরওঘটনাবহুল কাহিনি। আমরা তারিণীখুড়ো চরিত্রটি সম্পর্কে আর একবার ফিরে দেখতে পারি।

সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট অবিস্মরণীয় চরিত্র তারিণীখুড়ো। তিনি তারিণীখুড়ো চরিত্রটিকে ফেলুদা ও প্রফেসর শঙ্কুর অনেক পরে সৃষ্টি করলেও চরিত্রটি বাঙালির কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি এই চরিত্রটিকে একজন দক্ষ গল্পবলিয়ে প্রবীণ ব্যক্তি রূপে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তারিণীখুড়োর গল্প থেকে জানা যায় তারিণীখুড়ো ভারতবর্ষের তেত্রিশটি শহরে ঘুরে ছাপ্পান্ন ধরনের পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিলেন। তাঁর এই বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও নানান পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, তাই তাঁর গল্পগুলোর মুখ্য উপাদান রূপে কাজ করেছে। তাঁর গল্পগুলিতে অতিপ্রাকৃত স্পর্শ আছে। সত্যজিৎ রায় তারিণীখুড়োকে নিয়ে পনেরোটি গল্প লেখেন। যথা- মহারাজা তারিণীখুড়ো, তারিণীখুড়ো ও ঐন্দ্রজালিক, নরিস সাহেবের বাংলো, গণৎকার তারিণীখুড়ো, গল্পবলিয়ে তারিণীখুড়ো, ডুমনিগড়ের মানুষখেকো, কনওয়ে ক্যাসেলের প্রেতাত্মা, শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত, লখনউয়ের ডুয়েল, ধুমলগড়ের হান্টিং লজ, খেলোয়াড় তারিণীখুড়ো, টলিউডে তারিণীখুড়ো, তারিণীখুড়ো ও বেতাল, মহিম সান্যালের ঘটনা, জুটি।

কাহিনিগুলোতে তারিণীখুড়োর গল্পের শ্রোতা ছিলো পাঁচ কিশোর যথা পল্টু, ভুলু, ন্যাপলা, চটপটি ও সুনন্দ। পল্টুর দৃষ্টিকোণ থেকেই গল্পগুলি পাঠকের সামনে ফুটে ওঠেছে। তিনি পল্টুর বাড়ি এলেই পল্টুর এই চার সঙ্গী সেখানে উপস্থিত হতো তারিণীখুড়োর বৈচিত্র্যময় গল্প শোনার জন্য। তারিণীখুড়োর ঝোলায় ভূতের গল্প থেকে হাসির গল্প সবই আছে। তাঁর বলা অতিরঞ্জিত গল্পগুলোর সত্যতা যাচাই করার কোনো উপায় না থাকলেও তাঁর শ্রুতিনন্দন গল্পগুলো বাঙালি পাঠক – শ্রোতাদের মন জয় করেছে । সর্বোপরি তিনি গল্প বলাকে একটি শিল্প রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শৈশবে দাদু-ঠাকুমার কাছ থেকে গল্প শোনার আদলেই সত্যজিৎ রায় তারিণীখুড়োকে ও পাঁচ কিশোর শ্রোতাকে তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। তিনি যথার্থই বাঙালি মনন কে উপলব্ধি করে তারিণীখুড়োর গল্পগুলিকে নির্মাণ করেছেন। মূলত শিশু -কিশোরদের জন্য লেখা হলেও, তারিণীখুড়োর গল্পগুলির আকর্ষণীয় কাহিনির জন্য বাঙালি পাঠক সমাজ তারিণীখুড়োকে সাদরে গ্রহণ করে আপন হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন।

সর্বোপরি, বলা যায় সত্যজিৎ রায় একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকও ছিলেন। সহজ ভাষায় তথ্যসমৃদ্ধ তাঁর লেখনী বাঙালি পাঠকসমাজকে আজও আপ্লুত করে। এই বছর ওঁর জন্মশতবর্ষপূর্তিতে ওঁকে ও তাঁর সৃষ্ট তারিণীখুড়ো চরিত্রটিকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করে ওঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের প্রয়াস করলাম। ভারতের এই মহান প্রতিভা তাঁর জীবনের অমূল্য সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর হৃদয়ে চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। সবশেষে তাঁকে তাঁর ভাষাতেই প্রণাম নিবেদন করে বলি, " মহারাজা তোমারে সেলাম"।

অয়ন বর
২য় সেমিস্টার

সুস্মিতা সাহা
৪র্থ সেমিস্টার

নারীর স্বমহিমায় সত্যজিৎ

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?

~ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বয়ং কবির কথাতেও এমনই প্রকাশ পায় যে, নারীর নিজের ভাগ্য জয় করার প্রচেষ্টা এতটাও সহজসাধ্য নয় । যুগ যুগ ধরে নিজেকে একটু একটু করে নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে তাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে পুরুষশাসিত সমাজের দাসত্বের খোলস ছেড়ে । অনেক কঠোর কঠিন উপমার মধ্যে দিয়ে নারী পেয়েছে আজ নিজের অস্তিত্বকে ।কখনো সাহিত্যে,কখনো পর্দায় কখনো বা কঠিন বাস্তবতায় ।

বাঙালির ঘরের মানুষ সত্যজিৎ রায় (২মে,১৯২১ – ২৩এপ্রিল ১৯৯২) হলেন একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ও বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক । এছাড়াও একাধারে তিনি ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক, চিত্রনাট্যকার,প্রযোজক, চিত্রকর,লিপিকলাবিদ ও চলচ্চিত্র সমালোচক । বর্ণময় কর্মজীবনে তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন তবে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৯১ সালে পাওয়া 'একাডেমী সম্মানসূচক পুরস্কার 'অস্কার' । যা তিনি সমগ্র কর্মজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ অর্জন করেন ।

সাহিত্যে এবং লেন্সের সমীকরণে সত্যজিৎ রায়ের নারী- অনেকাংশেই বিপরীতমেরুর অবলোকন । সাহিত্যে তিনি নারীত্বকে একরকম এড়িয়েই গেলেন কিন্তু সেই তিনিই ক্যামেরার চোখে ফুটিয়ে তুললেন নারীর গভীরতর সংস্করণ । ভীষণ সাবলীলভাবেই তুলে ধরলেন নারীর অনুভব, টানাপোড়েন, আকাঙ্ক্ষা আর তার অভিলাষের গল্প ।

সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি 'ফেলুদা সিরিজে'র ৩৯টি কাহিনীর কোনোটিতেই কোনো স্ত্রী চরিত্রের প্রাধান্য দেখা যায় না । অন্যদিকে 'প্রফেসর শঙ্কু'র ৪০টি গল্প নারী বর্জিত । ছোটো-বড়ো সবার জন্য লেখা ১০০টিরও বেশি ছোটোগল্পে মাত্র দুটি গল্পে স্ত্রী চরিত্র মুখ্য ভূমিকায় দেখা যায় । 'পিকুর ডায়েরি' ও 'ময়ূরকণ্ঠী জেলী' দুটিই বড়োদের জন্য লেখা । এমনকি অনুবাদ সাহিত্যেও সত্যজিৎ নারী চরিত্রকে বাদ দিয়েছেন । অথচ রুপোলি পর্দায় নারীচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলোকে নিয়ে পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন সত্যজিৎ ।মোট ৩৪টি গল্প নিয়ে ছবি করেছেন, তার মধ্যে ১৯টি ছবিতে গল্পের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন মুখ্য ভূমিকায় থাকা কোনো নারী।

আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর সৃষ্ট আমার পছন্দের তিনটি নারী চরিত্রকে নিয়ে আলোচনা করলাম যারা তিনটি ভিন্ন স্তরের নারীর উদাহরণ।

১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালী'-র মুক্তির ব্যাপক সাফল্যের পর মুক্তি পায় 'অপুর সংসার'(১৯৫৯) যা অপু ট্রিলজির একক সৃষ্টি। সর্বজয়ার পর অপুর জীবনে একটি স্তম্ভ হয়ে ওঠে অপর্ণা। সদ্যপরিচিত ভবঘুরে একজন পুরুষকে সংসারের বাঁধনে বেঁধে সংসারের স্বাদ দিয়েছিল সেই-ই। নারী যে অনেকটা জলের মতোই শ্রেয়, তা ভীষণভাবে চোখে পড়ে অপর্ণার চরিত্রে। ছবিতে অপর্ণার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুরের বাঙ্ময় চোখ বলে দিয়েছিল অনেক না বলা কথাই।

অপর্ণার পর দয়াময়ী হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী'(১৯৬০)-তেও অভিনয় করেন শর্মিলা ঠাকুর। গলায় মালা পরে শুধুমাত্র ধর্মান্ধতার কারণে নিথর হয়ে ঠাকুরের আসনে বসে থাকা এক নারী।অন্যায় হচ্ছে জেনেও প্রতিবাদ না করতে পারার কষ্ট, বিশ্বাস, কাকতালীয়তা ও দেখানো ধর্মসাধনার একটা জট, ক্ষইয়ে দেয় তার চেতনাকে।সত্যজিৎ বুঝিয়েদেন ধর্মের প্রধান লক্ষণ বাস্তববিমুখতা। ধর্ম ,দেবতা যে একটা বিশ্বাস তার মাধ্যমে অযৌক্তিক অসম্ভব ক্রিয়াকলাপ অন্ধ বিচারবুদ্ধি মানুষের জীবনকে কিভাবে মানবিকতার সংকটে টেনে দাঁড় করায় দয়াময়ী তার ব্যতিক্রমী হয়নি।

এরপর মহানগর ছবির পটভূমিতে ফুটে উঠেছে ৫০-এর দশকের কলকাতা। রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ আরতির অপটু হাতে লিপস্টিক পরার মধ্যে ঘটে যায় নিঃশব্দ বিপ্লব। স্বামীর চাকরি হারানোর পর সংসারের প্রয়োজনেই সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চৌকাঠের বাইরে পা রাখে আরতি। তার হাত ধরেই আটপৌরত্ব দূর হয় মধ্যবিত্ত গৃহবধূদের। ১৯৬৩-তে দাঁড়িয়ে এমনই এক নারী চরিত্রকে ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন সত্যজিৎ আর এই চরিত্রে অনবদ্য হয়ে উঠেছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। আরতি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব পছন্দের চরিত্র। নারীর জয়গান যে নারীকেই লিখতে হয় এভাবেই।

এছাড়াও 'চারুলতার' চারু ; 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র অপর্ণা এবং দুলি ; 'নায়ক'এর অদিতি ; 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী প্রভৃতি চরিত্রগুলিও বাস্তব কল্পনা সব এক করে দিয়ে মুগ্ধ করে , বিচরণ করে দর্শকের মনোভূমিতে।

বাংলা তথা বিশ্বের কাছে জন্মশতবর্ষেও সত্যজিৎ রায়ের প্রভাব এতটুকুও কমেনি,সেই সত্যজিৎ রায়; যার দৃষ্টিতে আমরা খুঁজে পাই আমাদেরই কারও না কারো নিজস্বতাকে। একজন নারী হিসেবে বলতে পারি, নারী চরিত্রকে এত সহজ-সরলভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তোলায় যথেষ্ট অধ্যবসায়ের প্রয়োজন কিন্তু তা স্বমহিমায় সাবলীলতায় সৃষ্টি করে গেছেন আমাদের মানিকবাবু। ওঁকে জানার,চেনার এখনো অনেক বাকি, তবুও মানিকবাবুর জন্মশতবর্ষে ওঁকে নিয়ে, ওঁ র নারীচরিত্রদের নিয়ে প্রবন্ধ লেখার সাহস করলাম। হয়তো ভালোবাসা ভালোলাগাটা আছে বলেই অধিকারবোধটাও গভীর।

প্রীতি ঘোষ
৬ষ্ঠ সেমিস্টার

সত্যজিৎ রায় : জন্মশতবর্ষে কিছু কথা

সত্যজিৎ রায় (২ মে ১৯২১ – ২৩ এপ্রিল ১৯৯২) একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, শিল্প নির্দেশক, সঙ্গীত পরিচালক এবং লেখক। যাঁর ছবি দেখতে দেখতে সিনেমার ভূত চাপে, যাঁর গল্প পড়তে পড়তে লেখার দত্যি আসে খাতায়। যাঁর করা সুর শুনে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। তাঁকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। সত্যজিতের জন্ম কলকাতা শহরে সাহিত্য ও শিল্প সমাজে খ্যাতনামা রায় পরিবারে। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষ, স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র পথের পাঁচালী ১১টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে, পথের পাঁচালী(১৯৫৫), অপরাজিত (১৯৫৬) ও অপুর সংসার (১৯৫৯) – এই তিনটি একত্রে ‘অপু ত্রয়ী’ নামে পরিচিত, এবং এই চলচ্চিত্র-তিনটি সত্যজিতের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম হিসেবে বহুল স্বীকৃত। শুরুর দিকে কাজলের প্রতি অপুর আলগা ভাব, বাপ-ছেলের যে দূরত্ব সেইরকম। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষ সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় সেই ফেলুদা সিরিজেরই দ্বিতীয় মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’। আর সেখানেই আমরা দেখি কেস সল্ভ হওয়ার পরে তিনমূর্তি সবুজ এম্বাসেডর চেপে কলকাতা ফেরার পথে প্রখর রুদ্রের নতুন উপন্যাস নিয়ে গল্প করতে করতে ফেলুদা যখন বলে উঠলো 'বেস্টসেলার' আর তখন লং শটে সবুজ এম্বাসেডের দূরে চলে গেল। র‍্যাস্কিট, ডাকু গন্ডারিয়া, তারিণীখুড়ো, পিকু,রুকু, অনুকুল,অপু, দুর্গা,মুকুলকে প্রফেসর শঙ্কুর টাইম মেশিনে চাপিয়ে ওরা ফিরে আসবে। শুধু সিধু জ্যাঠার কথায় নিজের নিজের মনের দরজা খোলা রাখতে হবে যাতে আলো বাতাস ফেলু ও প্রফেসর শঙ্কুদের নতুন নতুন গল্প বলা গুলো বাঁচিয়ে রাখে। দিব্যি লেগেছিল চারমিনার, চায়ের সাথে নিউমার্কেট থেকে কেনা ডালমুট, সিগারেটের ধোঁয়া রিং, সকলবেলা নিয়ম করে যোগাসন, ভূতের রাজার ভোজ বসবে দুপুরে। ভোজের ওই ইয়া বড়ো রাজভোগ বা মাছের মুড়োটা আর পাতে পড়েনা, ভূতেও খায়না। ভূত যে নাচে তখন জেনেছিলাম যখন ছোটো ছিলাম। তখনই জেনেছিলাম দড়ি ধরে টানার প্রতিস্পর্ধা, আজও বিদ্রোহের বিপ্লবে কেউ বলতে পারে ‘ দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খানখান’। কর্মজীবনে তিনি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন, যার মধ্যে বিখ্যাত হল ১৯৯২ সালে পাওয়া একাডেমি সম্মানসূচক পুরস্কার (অস্কার), যা তিনি সমগ্র কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে অর্জন করেন। তিনি এছাড়াও ৩২টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ১টি গোল্ডেন লায়ন, ২টি রৌপ্য ভল্লুক লাভ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি ছোটোগল্প এবং উপন্যাস রচনা করেছেন। সত্যজিৎ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার ভারতরত্ন সম্মাননা প্রদান করে। সত্যজিৎ ভারতরত্ন এবং পদ্মভূষণসহ সকল মর্যাদাপূর্ণ ভারতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। অপু ত্রয়ী শেষ করার আগে সত্যজিৎ আরও দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ সমাপ্ত করেন। প্রথমটি ছিল ‘পরশপাথর’ নামের একটি হাস্যরসাত্মক ছবি। আর পরেরটি ছিল জমিদারি প্রথার অবক্ষয়ের ওপর নির্মিত ‘জলসাঘর’, যেটিকে তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও

তিনি বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, পলিন কেল মন্তব্য করেন যে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি সত্যজিৎ নারী নন, পুরুষ। কাছের মানুষদের কাছে সত্যজিতের ডাকনাম ছিল 'মানিক'। চারুলতা-পরবর্তী বছরগুলোতে সত্যজিৎ ছিলেন বৈচিত্র্যের সন্ধানী; এসময় কল্পকাহিনি ও গোয়েন্দা কাহিনি থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক ছবিও তিনি বানান। ১৯৮৩ সালে 'ঘরে বাইরে' ছবির কাজ করার সময় সত্যজিতের হার্ট অ্যাটাক ঘটে এবং এই ঘটনার ফলে জীবনের অবশিষ্ট নয় বছরে তাঁর কাজের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। স্বাস্থ্যের অবনতির ফলে ছেলে সন্দীপ রায়ের সহায়তায় সত্যজিৎ ১৯৮৪ সালে 'ঘরে বাইরে' নির্মাণ সমাপ্ত করেন। এরপর থেকে তাঁর পুত্রই তাঁর পরিবর্তে ক্যামেরার কাজ করতেন। অন্ধ জাতীয়তাবাদের ওপর লেখা রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপদানের ইচ্ছা সত্যজিতের অনেকদিন ধরেই ছিল এবং তিনি ৪০-এর দশকে ছবিটির একটি চিত্রনাট্যও লিখেছিলেন। যদিও ছবিটিতে সত্যজিতের অসুস্থতাজনিত ভুলের ছাপ দেখা যায়। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে সত্যজিৎ তাঁর শেষ তিনটি ছবি অভ্যন্তরীণ মঞ্চে নির্মাণ করেন। এগুলি তাঁর আগের ছবিগুলির চেয়ে আলাদা ও অনেক বেশি সংলাপনির্ভর। ১৯৮৯ সালে নির্মিত 'গণশত্রু' ছবিটিতে তাঁর পরিচালনা তুলনামূলকভাবে দুর্বল এবং এটিকে দীর্ঘদিনের অসুস্থতাশেষে ফিরে আসার পর সত্যজিতের চলচ্চিত্র নির্মাণের পুনঃপ্রচেষ্টা হিসেবেই গণ্য করা হয়।

মেঘা পাত্র
২য় সেমিস্টার

বিপাশা সাহা
৪র্থ সেমিস্টার

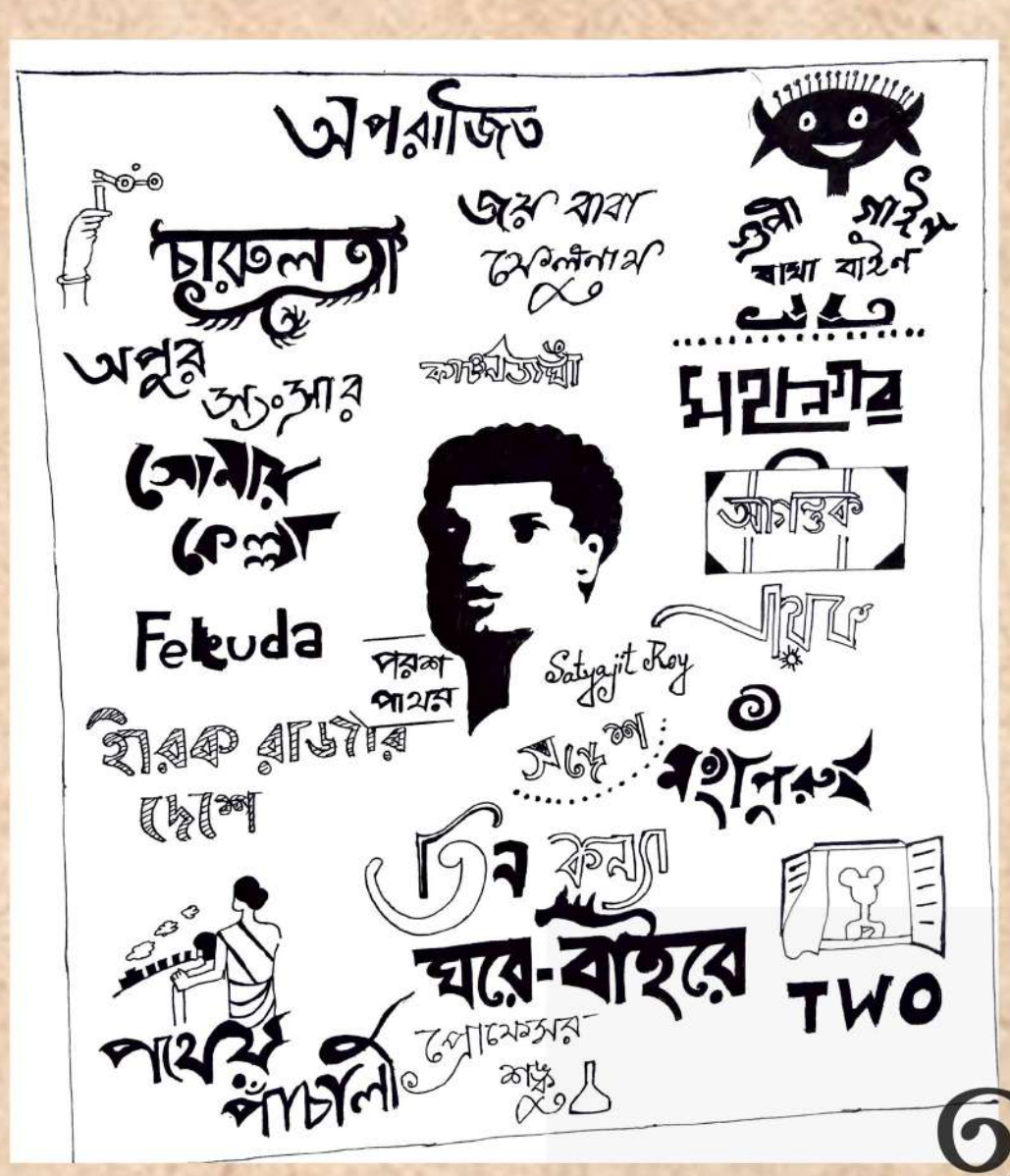

মৌসুমী পোল্ল্যে
২য় সেমিস্টার

সত্যজিৎ রায়ের অনন্য সৃষ্টি প্রোফেসর শঙ্কু

বিংশ শতকে যারা বাংলার শিল্প জগৎকে নানা রঙে সুচিত্রিত করার সাধনা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেন সত্যজিৎ রায়।শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার অবাধ বিচরণ ছিল।বিভিন্ন কালজয়ী চলচ্চিত্র সৃষ্টির পাশাপাশি তিনি ছিলেন সংগীতজ্ঞ,ছোটোগল্পকার।বহু চলচ্চিত্রে সংগীতস্রষ্টা রূপে সত্যজিৎ রায় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেন।তাঁর একাধিক কর্মকান্ডের মধ্যে আমার আলোচ্য বিষয় 'প্রোফেসর শঙ্কু'।এটি একটি কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা।প্রোফেসর শঙ্কুর সম্পূর্ণ নাম হল প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।তিনি গিরিডিতে বসবাস করতেন।গিরিডির এক স্কুল থেকে মাত্র ১২ বছর বয়সে ম্যাট্রিক, ১৪-তে কলকাতার কলেজ থেকে আই.এস.সি. এবং ১৬ বছর বয়সেই ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে ডবল অনার্স সহ বি.এস.সি পাশ করেন।বাড়িতে তিনি তার ২৪ বছর বয়স্ক পোষ্য বিড়াল নিউটন ও চাকর প্রহ্লাদকে নিয়ে থাকেন।শঙ্কু একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী,যিনি বিজ্ঞানের নানা রীতিনীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে আশ্চর্য জিনিস সৃষ্টি করেন।যেমন:-মিরাকিউরল বা সর্বরোগনাশক বড়ি-যা সেবন করলে সর্বরোগমুক্ত হওয়া যায়,অ্যানাইহিলিন পিস্তল-যা শত্রুকে নিহত না করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়,এয়ারকন্ডিশনিং পিল-যা জিভের তলায় রাখলে শরীর শীতকালে গরম আর গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা রাখে,এছাড়াও লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য রিমেমব্রেন,পাখিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অর্নিথন ইত্যাদি।'প্রোফেসর শঙ্কু' সত্যজিৎ রায়ের কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা হলেও গল্পগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে প্রোফেসর শঙ্কু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।তার চরিত্রের সৎ,নির্লোভ,দেশপ্রেমিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি তাকে পাঠকের হৃদয়ের অন্ত:স্থলে পৌঁছে দেয়।চরিত্র চিত্রণে সত্যজিৎ রায়ের দক্ষতা গল্পগুলিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।গল্পগুলি কাল্পনিক হলেও তিনি অনেক ক্ষেত্রে সচেতনভাবে ইউরোপ ও বিশ্বের ইতিহাসের কয়েকটি পটভূমি তুলে ধরেছেন।যেমন- 'স্বর্ণপর্ণী' গল্পে জার্মানিতে ইহুদিদের উপর নাৎসিদের অত্যাচারের একটি চিত্র পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।তাঁর কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির গভীরতা অতুলনীয়।হাস্যরস সৃষ্টি গল্পগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ।বিভিন্ন সময় নানাভাবে বিচিত্র হাস্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি গল্পগুলিকে আলাদা মাত্রা প্রদান করেছেন।সর্বোপরি প্রোফেসর শঙ্কুর রোমাঞ্চকর অভিযানের রহস্যময়তা ও বুদ্ধিমত্তা গল্পগুলিকে মজার করে তুলেছে।তাই আজ শুধু বাংলা নয় ,সারা বিশ্ব এর রসাস্বাদন করতে আগ্রহী।এর গ্রহণযোগ্যতা এখন দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ।এখানেই সত্যজিৎ রায়ের সার্থকতা।

সুকল্যান মুখার্জী
২য় সেমিস্টার

হীরক রাজার দেশে ও তার বর্তমানে রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত একটি জনপ্রিয় চলচ্চিত্র হল ' হীরক রাজার দেশে'। রূপকের আশ্রয় নিয়ে এই ছবিটিতে কিছু ধ্রুব সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গত ২রা মে তাঁর জন্ম শতবর্ষ পালিত হল। তাঁর সৃষ্ট শিল্পগুলি বাঙালি জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে, যা আমাদের জীবনে নিত্য রসদ যুগিয়ে গেছে। তেমনই' হীরক রাজার দেশে ' তাঁর একটি অভূতপূর্ব সৃষ্টি। গুপী গাইন বাঘা বাইনের ব্যবসায়িক সাফল্যের পর দীর্ঘ ১২ বছর বাদে হীরক রাজার দেশে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। এই প্রবন্ধে হীরক রাজা ও আজকের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ছবিটি আমি প্রথম দেখি ক্লাস সিক্সে, তখন শিশুমনে এক আলাদা আমোদের সঞ্চার হয়। যখন ক্লাস টুয়েলভে নবমবারের বেলায় ছবিটি দেখি তখন প্রাপ্তবয়স্ক মনে খুবই প্রভাব বিস্তার করে এই ছবিটি, তারপর টেলিভিশনের পর্দায় যে কতবার দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। এখন ছবিটির কথা মনে করলে আজকের ভারত তথা বিভিন্ন আধাঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের যে একনায়কত্বের আধিপত্য এবং তাদের হিন্দুত্বের আগ্রাসনের সাথে মিল খুঁজে পাই। রূপকের আড়ালে থাকা এই ছবিটি আদ্যোপান্ত একটি রাজনৈতিক ছবি।কিন্তু শেষে গিয়ে কোথাও যেন একটা খামতি থেকে গেল।

ছবিটির কাহিনী আশা করি পাঠকবৃন্দ সকলেই জানেন। তাই বিশদে না গিয়ে মূল পরিসরে আলোকপাত করছি। শোষিতের সাথে শাসকের সংঘাতের গল্পই বলেছেন সত্যজিৎ। বলা চলে ১৯৭৫-১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর ইমার্জেন্সী পিরিয়ডে রাষ্ট্রের আগ্রাসী চেহারা মানুষের সামনে চলে আসে।১৯৮০ সালের এই ছবি হয়তো তারই প্রতিবাদ স্বরূপ।

এই ছবিটির মূল যে জিনিসটি আমার নজরে আসে তা হল ' যন্তরমন্তর '। একটি মগজধোলাই যন্ত্র যেখানে রাজ্যের বিরোধী পক্ষদের ঢুকিয়ে মগজধোলাই করা হয়, তারপর তাদের মুখে বিভিন্ন মন্ত্র আরোপ করা হয়; যেমন কৃষকের মন্ত্র- ' ভরপেট নাও খাই, রাজকর দেওয়া চাই। শ্রমিকের মন্ত্র- ' অনাহার নাহি খেদ, বেশি খেলে বাড়ে মেদ'। শিক্ষার্থীর মন্ত্র হল- ' লেখাপড়া করে যে, অনাহারে মরে সে '।

বাস্তবিক শাসকগোষ্ঠী এই মন্ত্রণা জনগণের কাছে পৌঁছায় গণমাধ্যম দিয়ে। এই গণমাধ্যমই অধুনার যন্তরমন্তর যন্ত্র যা দিয়ে মানুষকে বোকা বানানোর কাজ চলছে। ধনতন্ত্রে মূলত এক শ্রেণী ফুলে ফেঁপে উঠছে আর অন্য শ্রেণী হয়ে পড়ছে ভূমিহীন, সর্বহারা। ধনতন্ত্রে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করা হয়, তেমনই আমরা দেখি হীরক রাজা ক্ষমতা গ্রহণের পর হীরার লোভে প্রজাদের যন্ত্রে পরিণত করে দেয়। এছাড়াও আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব রাজা ও পরিষদেরা ছন্দবদ্ধ ভাষায় কথা বলছে কিন্তু উদয়ন পণ্ডিত ও গুপী বাঘা নিজ ভাষায় কথা বলছে, এই ছন্দবদ্ধ ভাষা আসলে কৃত্রিম। বর্তমানে যেমন দেখি রাষ্ট্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষাকে জোর করে চাপানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সেখানে মানুষ এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবগত নয়।

রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর কিছু সাদৃশ্য আমরা এই ছবিতে দেখতে পাব। যেমন যক্ষপুরীতে সোনা উত্তোলনের কাজ করে শ্রমিকেরা। এছাড়াও মগজধোলাইয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে যন্তর মন্তর হল মন্দির, মদের দোকান। নাটকে যেমন দেখি নন্দিনী রঞ্জনের নাম থাকলেও রাজা অধ্যাপকের কোনো নাম নেই ঠিক উল্টো দিকে এই ছবিতে উদয়ন পণ্ডিত ও ছাত্রদের আলাদা নাম রয়েছে। এছাড়াও রাজার আদেশে পুড়িয়ে দেওয়া হয় বই পুঁথি। কারণ উদয়ন পণ্ডিতের মতো মানুষ থাকলে তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, এতে বাধাগ্রস্ত হয় রাজ্য পরিচালনা। তাই তো রাজা বলেন – ' এরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে।'

শেষে এক রক্তপাতহীন সংঘাতের মধ্যে দিয়ে বিদায় নিতে হয় রাজাকে। সকলে ময়দানে নেমে রাজার মূর্তিকে মাটিতে ফেলে দেয়।এসময় স্লোগান শোনা যায়- ' দড়ি ধরে মারো টান ,রাজা হবে খান খান '। যে রাজা এই যন্ত্র সভ্যতার জগৎ সৃষ্টি করেছে সে কিনা রাজ্য ভেঙে দেবার কাজে হাত লাগাচ্ছে। ইতিহাসে কি এইরকম ঘটনা সম্ভব? আসলে সত্যজিৎ যে বিপ্লব দেখিয়েছেন তা হল ' উদার মানবতাবাদী বিপ্লব।' আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদী সামন্তবাদে এই ঘটনা হাস্যকর। আসলে উদারনীতিকরা যেমন জনগণের রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্বাসী তেমনই অন্যদিকে আবার বিপ্লবের বিরোধীতা করে। সংস্কারেই তাদের অধিক আস্থা। এই উদারনীতির মধ্যে আটকে পড়েই সত্যজিৎ জনগণের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এক কাতারে সামিল করে দেন খোদ শাসককে। বাস্তব দুনিয়া এভাবে আদেও কি পরিচালিত হয়? প্রশ্নটা থেকে যায়। তবুও শেষে সত্যজিতের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব, কারণ রূপক সংকেতের আড়ালে লুকিয়ে থাকা চরম সত্যকে আমরা আজও বাংলা চলচ্চিত্রে খুঁজে পাইনা।

সপ্তর্ষি মুখার্জী
৬ষ্ঠ সেমিস্টার

সন্দীপ দাস
৬ষ্ঠ সেমিস্টার

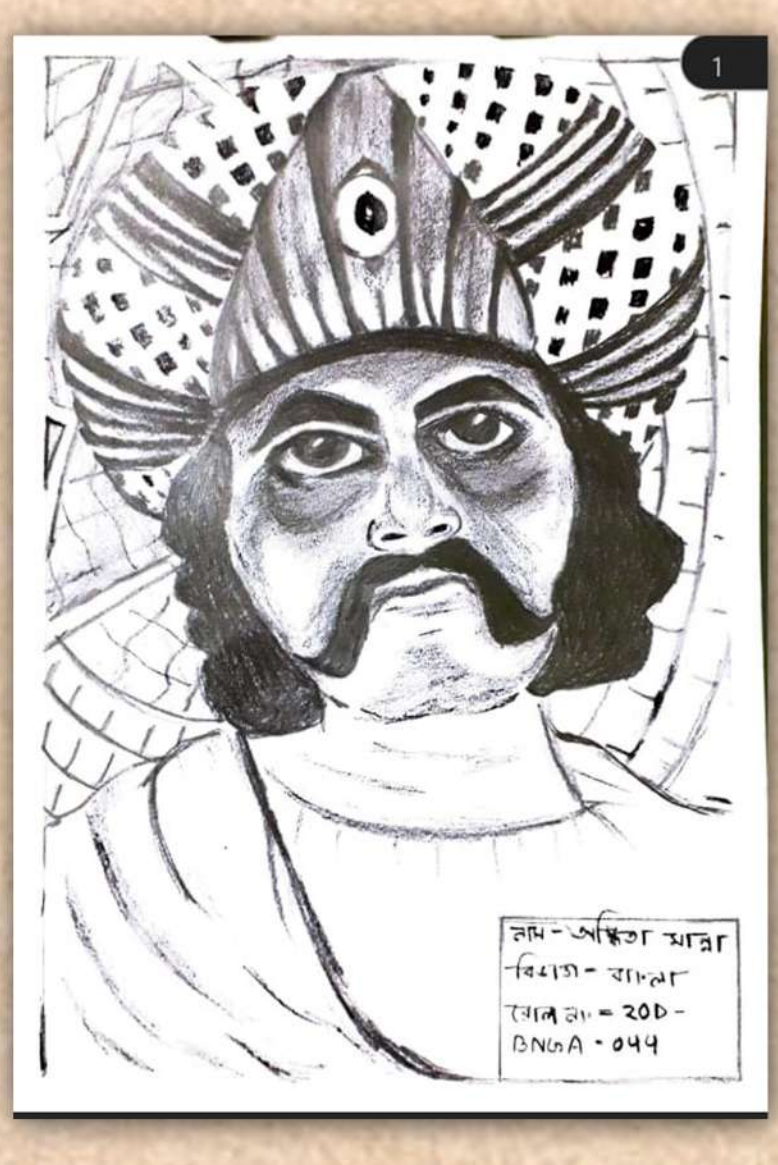

অঙ্কিতা মান্না
২য় সেমিস্টার